শিখধর্ম

গুরু নানক–প্রবর্তিত ধর্মমতকে শিখধর্ম বলা হয়। 'গু' শব্দের অর্থ অজ্ঞানতা ও অন্ধকার এবং 'রু' শব্দের অর্থ জ্ঞানালোক–আনয়নকারী। নানককে তাই জ্ঞানালোক–আনয়নকারী বলা হয়েছে। আবার ইসলামের সঙ্গে সদৃশতায় শিখধর্মে অবতারবাদ, জাতিভেদপ্রথা, প্রতিমাপূজা এবং বেদের প্রামাণ্যতা অস্বীকার করা হয়েছে। এই সমস্ত ব্যাপারে হিন্দুধর্মের পথে না চললেও ইসলামের বিরোধিতা করে শিখধর্মে পুনর্জন্মবাদ স্বীকৃত। নানক যেমন তাঁর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হিন্দুত্বকে মূল্য দিয়েছিলেন তেমনই ইসলামের মর্যাদাকেও স্বীকার করেছিলেন।

ব্যক্তিগত বিশ্বাসে বা ধর্মাচরণে শিখেরা মধ্যপন্থা অনুসরণ করেন কিন্তু স্বয়ং ভগবানই যে একমাত্র উৎস বা উপাস্য একথা বিশ্বাস করেন। গৌণ অর্থে গুরু নানককে গুরু বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং ঈশ্বরই গুরু। অন্যরা এই হিসেবে গুরু যে, তাঁদের মাধ্যমে ঈশ্বরের বাণী ব্যক্ত হয়।

গুরু কে? গুরু হচ্ছেন তিনি, যিনি সেই নামকে জাগিয়ে তোলেন, যিনি অন্ধকারে আলো। গুরু শব্দের সঙ্গে ঝংকার ওঠে মনে, গুরু আমাদের পবিত্র ও জ্ঞানের আলোকে উদ্‌ভাসিত করেন। সেই পরমপিতার সঙ্গে আমাদের মিলনের পথ দেখান তিনি।

আনুষ্ঠানিক শিখগুরুদের সংখ্যা গুরু নানক থেকে আরম্ভ করে দশ, তাঁদের পরিচালনাধীনে শিখধর্মসম্প্রদায় প্রসারিত হয়েছিল। দশম গুরু গোবিন্দ সিং ঘোষণা করলেন তিনিই শেষ গুরু। তাঁর দেহান্তের পরে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ (যা ইতিমধ্যে গ্রথিত হয়েছে) মানবগুরুর পরিবর্তে শিখসম্প্রদায়ে গুরুর স্থান নেবে। 'গুরু গ্রন্থসাহিব' নামে অভিহিত এই শাস্ত্র জ্ঞানলব্ধ পবিত্র বাণীর সংকলন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত এই মহাগ্রন্থ শিখদের কাছে জীবন্ত গুরুর মর্যাদাপ্রাপ্ত। এই গ্রন্থে সংকলিত ঈশ্বরের ইচ্ছা

এবং বাণীকে জীবন্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। অমৃতসরে পবিত্রতার সঙ্গে এই গ্রন্থ রক্ষিত আছে।

শিখদের পঞ্চম গুরু শ্রীঅর্জুনজী 'গ্রন্থসাহিব' সংকলন করেন এবং এতে পূর্বতন গুরুদের অমূল্য বাণীসমূহ সন্নিবেশিত হয়। এই গ্রন্থই 'আদি' গ্রন্থসাহিব নামে পরিচিত। দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের রচনাবলী সংগ্রহ করে ভাই মণিসিংহ আর একটি গ্রন্থসাহিব সংকলন করেন। অর্জুনজীর গ্রন্থকে শুধু 'আদি' বলা হয়।

গ্রন্থসাহিবের বাণীগুলি শিখেরা বিভিন্ন রাগের মধ্য দিয়ে গান করেন। শিখ ধর্মসাহিত্যের মধ্যে রয়েছে সেওয়াদাসের 'জনমসাখী', ভাই সন্তোখ্ সিং-এর 'গুরুপ্রতাপ সূরয' ইত্যাদি। ভাই গুরুদাসের রচিত 'উঅর' এবং 'কোবিৎ' শিখদের পরম প্রিয়।

শিখেরা ঈশ্বরের সঙ্গে একীভূত হয়ে মুক্তি কামনা করেন। উপলব্ধির দ্বারা এবং অন্তরের গভীরে বিদ্যমান ঈশ্বরকে ভালবাসার দ্বারা ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়াই চরম লক্ষ্য। ঈশ্বরলাভ ব্যতীত জীবন অর্থহীন; ভগবানের সঙ্গে বিচ্ছেদই মানুষের দুঃখের কারণ। নানকের ভাষায়, 'ভগবানের সঙ্গে বিচ্ছেদ কী নিদারুণ কষ্টের এবং ভগবানের সঙ্গে মিলন কী আনন্দের!'

শিখমতে সর্বত্যাগের কথা বলা হয়নি। শিখেদের ভিতর ত্যাগ, কঠোর তপস্যা, ব্রহ্মচর্য অথবা ভিক্ষার কোনও ঐতিহ্য নেই। তাঁরা গৃহী এবং অর্থোপার্জনের দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করেন এবং তার সাথে আয়ের এক দশমাংশ দান করেন।

বর্তমান পৃথিবীতে প্রচুর সংখ্যায় শিখ আছেন, তাঁদের অধিকাংশই থাকেন ভারতবর্ষে (তার মধ্যে গরিষ্ঠ অংশ পাঞ্জাবে)। তাঁদের প্রধান ধর্মস্থান হল পাঞ্জাবের অমৃতসরে অবস্থিত বিখ্যাত স্বর্ণমন্দির।

গুরু নানক

১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দ। কার্তিকী পূর্ণিমা তিথি। জ্যোৎস্নালোকে স্নাত রজনীশেষে আনন্দময় প্রকৃতির কোলে সাদর সম্ভাষণ পেল এক নবজাতক। পাঞ্জাব প্রদেশে লাহোর থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত তালওয়ান্দি গ্রামে শিখধর্মের ভাবী প্রতিষ্ঠাতা সেই শিশুকে অন্তরের পূজা নিবেদন করল অগণিত মানুষ। শিশুর নাম রাখা হল নানক। তাঁর মা তৃপ্তা ছিলেন ধর্মপ্রাণা। বাবা কালু একাধারে ছিলেন ব্যবসায়ী, কৃষিজীবী ও হিসাব-পরীক্ষক। এছাড়া একজন মুসলমান রাজপুত জমিদারের সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতেন তিনি। বাল্যকাল হতেই নানক পিতামাতা ও সঙ্গীদের নিকট অনন্যতার পরিচয় দিয়েছেন। পাঁচ বছর বয়সেই হিন্দুশাস্ত্রের তত্ত্ববিষয়ে ব্যুৎপত্তির পরিচয় দেন তিনি। সাত বছর বয়সে তাঁর পিতা তাঁকে বিদ্যালয়ে পাঠান। খুব কম সময়ের মধ্যে তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করেন।

নানক কখনও সমবয়সী সঙ্গী শিশুদের মতো খেলাধূলায় মেতে সময় কাটাতে চাইতেন না। তাঁর জন্মভূমি তালওয়ান্দি গ্রামের কাছাকাছি অরণ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুদের আস্তানায় যাতায়াত করতেন তিনি এবং জীবন-মৃত্যু প্রভৃতি গূঢ় তথ্যের আলোচনায় মগ্ন হতেন। অল্প বয়সেই নানকের ভাবোন্মাদনা আরম্ভ হয় এবং সে-সময় তাঁর দেহের বাহ্যিক লক্ষণগুলি দেখে তাঁর পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজন সকলেই চিন্তিত হন।

নয় বছর বয়সে উপবীতধারণ অনুষ্ঠানে বালক নানক পুরোহিতের কাছে বলেন যে, কোনও উপবীতই মানুষকে অন্যায় আচরণ হতে দূরে রাখতে পারে না, প্রকৃত ধর্ম অন্তরের সম্পদ।

বারো বছর যখন তাঁর বয়স তখন তাঁর পিতা একদিন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানালেন যে, নানকের দ্বারা সংসারের কোনও উপকারই হচ্ছে না। তবু আশায় বুক বাঁধলেন পিতা, নামকরণের সময় পুরোহিত ঘোষণা করেছিলেন যে, নানক বড় হয়ে বংশের মুখ উজ্জ্বল করবেন।

সতেরো বছর বয়সে পিতা একবার অনেক আশায় তাঁকে কিছু টাকা দিয়ে ব্যবসা করতে পাঠালেন। কিন্তু পথে একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর

সাক্ষাৎ হল। তাঁরা তিন-চার দিন উপবাসী জানতে পেরে নানক তাঁর সমস্ত টাকাই সাধুদের সেবায় খরচ করলেন। খালিহাতে বাড়ি ফিরে পিতার হাতে মার খেতে হল তাঁকে। পিতা তাঁকে কৃষি, গো-মহিষাদি পালন, বিভিন্ন রকমের ছোটখাটো ব্যবসা প্রভৃতিতে নিযুক্ত করলেন, কিন্তু কিছুতেই ফল হল না। স্পষ্ট বোঝা গেল, বৈষয়িক ব্যাপারে নানক সম্পূর্ণ নিরুৎসাহ ও উদাসীন।

পুত্রের কার্যকলাপে পিতা কালু ও মাতা তৃপ্ত তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে পড়লেন। নানককে তাঁরা পাঠিয়ে দিলেন তাঁর বোন নানকির বাড়িতে। এবার কিন্তু সকলকে বিস্মিত করে দিয়ে কৃতিত্ব দেখালেন নানক। সুলতানপুরে সরকারি চাকরিতে বহাল হলেন তিনি ভগিনীপতি জয়রামের সুপারিশে। পিতার শাসন হতে মুক্ত হয়ে যেন তিনি বেশ স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করতে লাগলেন। একবৎসরকাল বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করলেন তিনি এবং তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠায় ও ন্যায়পরায়ণতায় সুলতান দৌলত খাঁ লোদী বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন। এ-সময়ে তিনি বিবাহ করেন এবং ক্রমে তাঁর দুই পুত্রের জন্ম হয়।

প্রতিদিন ভোরবেলায় দিনের কাজ আরম্ভ হওয়ার আগে নিকটবর্তী রাভি নদীতে স্নান করতে যেতেন নানক। একদিন স্নানের পর ঈশ্বরদর্শন হল নানকের। সেদিন নদীতে ডুব দিতেই জলতরঙ্গের স্বরলয়ে একটি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর তাঁর শ্রুতিগোচর হল। অন্তরের নিস্তব্ধতায় তিনি ঈশ্বরকে অনুভব করলেন। সেই পরমপিতার সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগাযোগ সৃষ্টি হল। নানক উপলব্ধি করলেন, তিনি পার্থিব সকল পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন, একমাত্র ঈশ্বরের সঙ্গেই তাঁর আত্মার ঐক্য।

জল থেকে উঠলেন নানক, তাঁর মুখমণ্ডল এক অপার্থিব আলোকে উদ্ভাসিত। নানক সেই অন্তরাত্মার দর্শন লাভ করলেন যাঁর দীপ্তি নদীকে পূর্ণ করে, সূর্য, তারকা ও হৃদয়মন্দিরকে বিকশিত করে।

গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্বন্ধ নতুনভাবে উপলব্ধি করলেন নানক এবং অন্তর থেকে নির্দেশ পেলেন যে, তাঁকে শহরে শহরে গিয়ে

নরনারীর অন্তরের ব্যাধি দূর করতে হবে। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর নিজের বলে কোনও জিনিস নেই। জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান অধিকার হল নিজের সম্পদ সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া। পৃথিবীকে নতুন দৃষ্টিতে দেখলেন নানক। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট সেই পরমপিতার বাণী পৌঁছে দিতে প্রস্তুত হলেন তিনি।

এক বিরাট পরিবর্তন এল তাঁর জীবনে, বিষয়কর্মে পুনরায় উদাসীন হয়ে পড়লেন তিনি। নিজের সম্পদ বলে যা ছিল সব বিলিয়ে দিলেন গরিব-দুঃখীদের মধ্যে। গুরু নানক বলতে লাগলেন, হিন্দু বা মুসলমান বলে ভিন্ন কোনও সত্তা নেই। কাজি ও মোল্লাদের অভিযোগে দৌলত খাঁ লোদী নানকের কাছে কৈফিয়ত চাইলেন। নানক বললেন, সকল ধর্মের সারতত্ত্ব ভগবানে আত্মসমর্পণ। এই বোধ না থাকলে আচার-অনুষ্ঠানাদি মিথ্যা। নানকের একথার প্রতিবাদ করতে পারলেন না কেউ। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে নিজের ধর্মমত যাচাই করে নিলেন তিনি।

পরিব্রাজকরূপে নানাস্থানে ভ্রমণ করলেন নানক ও ধর্মের মূলতত্ত্ব প্রচার করলেন। বারো বছর ধরে হাজার হাজার মাইল ভ্রমণ করে সর্বত্র মানবসমাজকে শোনালেন নামধর্ম। নানকের সময় ইসলাম ও হিন্দু এই দুই ধর্ম পরস্পর জোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। লোদী বংশের পতন এবং দিল্লীতে বাবর কর্তৃক মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন তখন সমগ্র উত্তর ভারতে, বিশেষত পাঞ্জাবে অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল। দেশবাসীর নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটেছিল।

নানক সহকর্মী হিসেবে মর্দানা নামে একান্ত অনুরক্ত একজন সঙ্গীতজ্ঞ মুসলমানকে বেছে নিলেন। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত পোশাক পরিধান করলেন নানক। সঙ্গীতের মাধ্যমে তিনি প্রচার করলেন, 'আমি মানুষকে পথ দেখাতে এসেছি। আমি একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া কারুকে জানি না, জাতিভেদ মানি না।'

প্রথম অভিযানে নানক হরিদ্বার হতে আরম্ভ করে উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থস্থান পর্যটন করেন। পূর্বে কামরূপ ও দক্ষিণে পুরী পর্যন্ত অগ্রসর

হয়ে পাঞ্জাবে ফিরে এলেন নানক। এই ভ্রমণে অনেক কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁদের। মা-বাবা দুজনে এসে নানককে গৃহে ফিরে সংসারী হবার জন্য সকাতর অনুরোধ করলেন বারবার। নানক জানালেন, ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুযায়ী তিনি যে-কাজে ব্রতী হয়েছেন, সে-কাজে যেতে যেন তাঁরা তাঁকে অনুমতি দেন এবং আশীর্বাদ করেন।

দ্বিতীয়বার ধর্মপ্রচারে বের হলেন নানক। এবার তিনি সিংহল প্রভৃতি স্থানে ধর্মপ্রচার করলেন। তৃতীয় যাত্রায় তিনি হিমালয় অঞ্চলের দিকে গেলেন এবং সেখানে বহু যোগীর সঙ্গে ধর্মবিষয়ে আলোচনা হল তাঁর। এ-সময় তিনি সম্ভবত তিব্বত ও চীনেও গিয়েছিলেন। চতুর্থবারে তিনি ভারতের কয়েকটি তীর্থস্থান ছাড়া, মক্কা, মদিনা, বাগদাদ, জেরুজালেম, দামাস্কাস, মিশর প্রভৃতি স্থানেও নামধর্ম প্রচার করেন। প্রতি স্থানে তিনি সৎসঙ্গের অধিবেশন বসালেন। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে ঈশ্বরের নাম বিলালেন সকল জাতি ও ধর্মাবলম্বীদের মাঝে। নামকীর্তনের মধ্য দিয়ে ভক্তির বন্যা বইয়ে দিলেন দেশে দেশে।

কলম্বোয় সিংহলের রাজা শিবনভ তাঁকে প্রশ্ন করেন, আপনি কি প্রাচীন যোগী অথবা সন্ন্যাসীর প্রবর্তিত নীতি অনুসরণ করেন? উত্তরে নানক একটি গান করেন যার মর্মার্থ হল—হে প্রভু, যখন তুমি আমাকে ডাক দাও, তখন তোমার সঙ্গে আমি মিলিত হই। তোমার নামে যার অবস্থান সে সবকিছুর ওপরে তোমার সেবার মাঝেই জেগে থাকে। রাজা সে গান শুনে কেঁদে ফেলেন।

লাহোরে দুনিচাঁদ নামক এক ধনী ক্ষত্রীকে একটি সূচ দিয়ে নানক বলেন, 'দুনিচাঁদ, এটি তোমার সঙ্গে রাখো, পরজগতে এটা আমাকে ফেরত দিও।' দুনিচাঁদ বললেন, 'প্রভু, মৃত্যুর পর কেমন করে এ সূচটি নিয়ে যাব, কেমন করে আপনাকে ফেরত দেব?' নানক বললেন, 'দুনিচাঁদ, তাহলে তোমার এই লক্ষ লক্ষ টাকার কি প্রয়োজন?' দুনিচাঁদের জীবনে পরিবর্তন এল। গুরু নানকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে দরিদ্রের সেবায় নিজের অধিকাংশ সম্পদ তিনি দান করলেন।

মক্কায় সুবিখ্যাত কাবা মসজিদের নিকট ঈশ্বরের সার্বজনীনতা প্রচার করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন নানক। একদিন রাত্রে কাবা মসজিদের দিকে পা রেখে

ঘুমাচ্ছিলেন তিনি। একজন মোল্লা তাঁকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঈশ্বরের দিকে পা রেখে ঘুমাচ্ছ কেন?' গুরু নানক উত্তর দিলেন, 'যেদিকে আল্লাহ্ নেই, সেদিকে ঘুরিয়ে দাও আমার পা।' ধর্মগুরুর এ প্রশ্নের উত্তর নেই। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান।

শেষজীবনে পাঞ্জাবের শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে ঘুরে ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করলেন তিনি। তাঁকে কেন্দ্র করে একটি নতুন ধর্মসমাজ গড়ে উঠল। ইরাবতী নদীর তীরে করতারপুর নামক স্থানে তাঁর আশ্রম স্থাপিত হল। এই সময় শিখধর্মের মূল ব্যবস্থাগুলি সুসংবদ্ধ হয়। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে প্রিয় শিষ্য অঙ্গদকে তাঁর উত্তরসাধকরূপে স্থির করলেন তিনি। অঙ্গদের মাথার উপর ছত্র ধারণ করে প্রণতি জানালেন নানক। সকলে বুঝতে পারলেন, ধর্মগুরুর জীবনে যবনিকা ঘনিয়ে আসছে।

হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যদের মধ্যে বিষম তর্ক উঠল তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে। হিন্দু ভক্তেরা চাইল তাঁর মৃতদেহ দাহ করতে, আর মুসলমানেরা চাইল কবর দিতে। নানক বলেছিলেন, হিন্দুরা আমার ডানদিকে ও মুসলমানেরা আমার বামদিকে কতকগুলি ফুল রেখে দেবে। আগামীকাল সকালে যাদের ফুল তাজা থাকবে তারাই নেবে আমার মৃতদেহের ভার।

সঙ্গীতধ্বনির মাঝে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ধর্মগুরু। পরদিন যখন তাঁর দেহের আচ্ছাদন তোলা হল তখন তার মধ্যে ওই দুই স্তবক তাজা ফুল ছাড়া নানকের শরীর আর দেখা গেল না।

গুরু নানকের প্রচলিত উপাসনা-পদ্ধতিতে আড়ম্বর নেই এবং তা সকল লোকের অধিগম্য। জাত্যভিমান পরিত্যাগ করে সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে ভগবানের নাম ও গুণকীর্তনই এই উপাসনার প্রধান অঙ্গ। নানক সকলকে বুঝিয়ে দিলেন যে, সাধারণ মানুষ ধর্মের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করে গৌণার্থ নিয়ে মারামারি করে বলেই দেশে এত বাদবিসংবাদ ও সমাজে এত অশান্তি। অনেকে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত?' নানক উত্তরে বলেন, 'অগ্নি ও কাষ্ঠ যে সম্প্রদায়ভুক্ত আমিও তাই। আমি সেই এক ঈশ্বরের পূজারি। তাঁকে আমি দেখি মর্তের ধূলিতে, ঊর্ধ্বে গগনে ও সকল দিকেই।'

গুরু নানকের প্রধান কথা ছিল অন্তর ও হৃদয়ের সুন্দর গুণাবলী। ধর্মে বিশ্বাস মানুষের লুপ্ত হয় তখন, যখন জীবন থেকে ধর্ম পৃথক হয়ে পড়ে। ধর্ম মানুষের নিজস্ব সম্পদ হবে তখন, যখন মানুষ সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে শিখবে। নানক মানুষকে মানবভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেন। দরিদ্রের ও অধঃপতিতের সেবাকে তিনি ধর্মে প্রধান স্থান দিয়েছেন। প্রেমময় ঈশ্বরের চিন্তায় মগ্ন হবে শিষ্যেরা । ধ্যানই জপ ও মন্ত্র। আট প্রকার অভ্যাস বা সাধনাই হল মন্ত্র : (১) পবিত্রতা, (২) নিস্তব্ধতা, (৩) মনঃসংযোগ, (৪) মন্ত্রের অর্থোপলব্ধি, (৫) ধৈর্য ও সন্তোষ, (৬) বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা, (৭) সৎসঙ্গ ও (৮) দৈনন্দিন জীবনে মন্ত্রের সাধনা। নানকের সঙ্গীত ও বাণীগুলি পাঁচটি ধর্মগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে : (১) জপজী, (২) পাট্টি, (৩) অরাটি, (৪) দক্ষিণীয় ওঙ্কার এবং (৫) সিংহগোষ্ঠী।

নানকের জীবন প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সেই এক সত্য শিক্ষা দিয়েছে যে, দেশ অথবা সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে প্রত্যেক মানুষ অন্তরে এক-একজন নানক। সেই চিরন্তন বিরাট পুরুষের নিকট ভালবাসার ধর্মে অর্পিত সকলে ।

নানকের কথায় প্রকৃত সাধুর থাকবে অন্তর্দৃষ্টি । প্রকৃত সাধু হবেন বিনয়ী ও দীনদুঃখীর সেবক, হবেন সেই আন্তর-সত্তার পূজারি। তাঁর 'সৃষ্টির স্তুতিগান' আরতি-সঙ্গীতে নানক সেই নিগূঢ় ধর্মের কথা গেয়েছেন, যে ধর্মে বিশ্বাস ও বিজ্ঞান পরস্পর সামঞ্জস্যের মাঝে মিলিত হয়েছে সেই অনন্তের জ্ঞানে।

নানক শব্দের এক অর্থ 'অগ্নি'। স্বর্গীয় অনলে উদ্ভাসিত হয়েছিলেন ধর্মগুরু নানক। দুর্বল ও দরিদ্র মানব, সত্যের পূজারি মানবের জন্য জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তিনি একটি বিশেষ সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে আসেননি। তিনি প্রেম ও মহান কর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন ধর্মের আসনে। তিনি ঘোষণা করেন, সমগ্র মানবসমাজ সেই পরমপিতার সন্তানের দল। ধর্মগুরু নানকের ভাষায়—

'বাঝু সচ্চা নাম দে হোর করামাৎ অসাথে নাহি।' অর্থাৎ 'এক সৎনাম ভিন্ন অন্য কোনও কেরামতি আমার নিকট নেই।'

গুরু নানকের বাণী

তোমার দেহ হোক ক্ষেত্র, সুকার্যের বীজ বপন করো সেই ক্ষেত্রে। ঈশ্বরের নামের দ্বারা সেই ক্ষেত্র জলসিঞ্চিত করো এবং তোমার অন্তর করুক কর্ষণ। তাহলে ঈশ্বর তোমার অন্তরে অঙ্কুরিত হবেন, তোমার মুক্তিলাভ ঘটবে।

জীবন ক্ষণস্থায়ী—এই জ্ঞানই হোক তোমার বিপণি এবং ঈশ্বরের কথা হোক মূলধন। প্রার্থনা ও ধ্যান হোক পাত্র এবং সেই পাত্রগুলি ঈশ্বরের কথায় পূর্ণ করো।

সততা হোক তোমার অশ্ব এবং সংযমের পোশাকে ভূষিত হয়ে সত্যের তলোয়ার ও ঢাল নিয়ে জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হও তুমি।

তোমার অন্তরে রয়েছে ঈশ্বর, তাঁকে অন্যত্র খুঁজছ কেন? সবার ওপরে সত্যের স্থান। কিন্তু সত্যজীবন আরও ওপরে। যিনি সকলের মাঝে সেই পরমপিতাকে দেখতে পান তিনিই ধার্মিক। পার্থিব সকল প্রলোভনের মাঝে থেকেও যিনি শুদ্ধচিত্ত তিনিই ধর্মের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন।